ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২৫৩-২৭০
**DOI:** https://doi.org/10.59815/isp.vol4117

# বাংলাদেশে নারী অধিকার রক্ষায় প্রণয়নকৃত আইনসমূহের প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতা: একটি পর্যালোচনা

**সানজিদা মুস্তাফিজ**
সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল,
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

**Abstract:** There are numerous laws about woman's rights in the global context. There are many international laws and charters also. Like many progressive countries Bangladesh also has strict laws to protect women's rights. Despite these laws, women are still being deprived and subjected to torture. As woman are subjected to discriminatory policies and practices, they are also directly and indirectly disadvantaged in the economic and political spheres. A real picture of women's progress can be seen in various fields especially in the economic fields and in their presence in main stream society. However, despite participating in multi-dimensional activities, significant efforts to stop torture and violence against women have not been observed. In the field of family law women's advancement in society is hampered by the absence of equality-based provisions. Efforts that should be made to advance the position of women in the state and society require the establishment of customary rights. The purpose of this article is to analyze the context in which the laws related to women's rights and protection have been enacted in Bangladesh and to identify the barriers to the laws enacted and the role of the law in taking steps for the welfare of women. At the same time in the perspective of human rights, how the dignity and rights of women in Bangladesh can be evaluated as a part of the history of law has also been tried to be presented in the article.

**Key Words**: Women's Right, Law Enforcement, Legal Frame Work.

**ভূমিকা:** নারী অধিকার বলতে মানুষ হিসেবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা এবং আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তাকে বুঝানো হয়। সমতা ও বৈষম্যমুক্তভাবে বিভিন্ন মানবাধিকারের প্রাপ্তির নিশ্চয়তায় প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সুযোগ প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগও নারী অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারী অধিকার নিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আইন রয়েছে,

সেসাথে আছে আন্তর্জাতিক আইন ও সনদ। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রে নারী-পুরুষ সকল নাগরিকের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার থাকবে এবং নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য থাকবে না। একই সাথে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী বলে উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে নারী অধিকার রক্ষায় কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এসব আইন থাকা সত্ত্বেও এখনও নারীরা বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার। বিভিন্ন দিকে বিশেষ করে অর্থনৈতিক এবং সমাজের মূল ধারায় সরব উপস্থিতির ক্ষেত্রে নারীর এগিয়ে চলার উল্লেখযোগ্য চিত্র বাস্তবে দেখা যায়। পেশাদারি দক্ষতা অর্জনেও নারীর সাফল্য লক্ষ করা যায়। তবে নারীর মানবাধিকার পরিস্থিতি একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় অসঙ্গতি দেখা যায়। রাষ্ট্র কিংবা সমাজের মূল ধারার কিছু ক্ষেত্রে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বীকৃতি আইনগতভাবে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পারিবারিকভাবে নারীর মানবাধিকার বাস্তবে স্বীকৃত হচ্ছে না। সেসাথে পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে সাম্যভিত্তিক বিধান প্রণয়নে সমাজের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে সে বিষয়টিও নারীর অগ্রযাত্রায় বাধা প্রদান করে। রাষ্ট্র ও সমাজে নারীর অবস্থানকে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন প্রচলিত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা এবং তা করার লক্ষ্যে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোগুলো পরিবর্তন করা।

**গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

সমাজে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামষ্টিকভাবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এবং আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে নারী অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক আইনসমূহ কোন প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়েছে এবং প্রণয়নকৃত আইনসমূহের প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে নারীর জন্য মঙ্গলজনক এমন সব বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে আইনের ভূমিকার বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি আইনের ইতিহাসের অংশ হিসেবে কীভাবে মূল্যায়িত হতে পারে সেটিও উক্ত প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধের ফলাফলে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ধরে রাখার জন্য যে সকল আইন, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নীতিমালা রয়েছে তা নির্মূল করতে আইনগত পদক্ষেপ কতটা কার্যকর তার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের নারীর অধিকার রক্ষা, নিরাপত্তা, কল্যাণ, ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোনো গবেষণা হয়নি বলে উক্ত গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

## গবেষণা পদ্ধতি

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা নির্ভর একটি গবেষণা হিসেবে এ প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে উক্ত আইনসমূহের বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কীভাবে নারী অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করে সে বিষয়টি এ প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে প্রাধান্য পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে গবেষণাটিতে গুণগত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় আইনের বিষয়ে প্রাথমিক উৎস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তথ্যের সময়, প্রাপ্তিস্থান, তথ্যসূত্রের যোগানদাতা, কোন বিষয়ের প্রেক্ষাপটে তথ্যসূত্রের আবির্ভাব তা ব্যবহারের পূর্বে যাচাই করা হয়েছে। সেসাথে প্রবন্ধে উপস্থাপনের পূর্বে এসব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।[১] প্রাথমিক উৎস ব্যবহারের সাথে গবেষণার সার্বিক কাঠামো নির্ধারণে, তথ্য বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নারী অধিকার বিষয়ক আইনসমূহ, বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জার্নাল, প্রবন্ধ, পত্রিকা উৎসের মধ্যে অন্যতম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলন এর এজেন্ডাসমূহও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সাথে কিছু অনলাইন প্রকাশিত পত্রিকা হতে বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য নেয়া হয়েছে।

## নারী অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা

বিশ শতকের শুরু থেকে আন্তর্জাতিকভাবে নারী অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ সনদেও নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের ৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ Commission on the Status of Women নামে নারী মর্যাদা সম্পর্কিত একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন: The Convention on the Political Rights of Women নামে ১৯৫২ সালে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন, বিবাহিত নারীর জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন।[২] নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) নামে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি সনদ গৃহীত হয়। ৩০টি ধারা সম্বলিত এ সনদটি ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে শুরু করে। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিধান ও অধিকার এ সনদে সংযুক্ত করা হয়েছে।[৩] পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ কনভেনশনের প্রথম ভাগে নারীর অধিকার রক্ষা এবং অগ্রগতির বিষয়ে সাংবিধানিক, আইনগত, প্রশাসনিক দিকসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সহমত প্রকাশ করে।[৪] কনভেনশনের দ্বিতীয় ভাগ হতে ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত নারীর বিভিন্ন অধিকার ও

অধিকার রক্ষার পরিকল্পনার বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ কনভেনশনটিতে একটি Optional Protocol সংযুক্ত করা হয় যা ২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর কার্যকর হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে 'নারীর অধিকার মানবাধিকার, নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন'– এ স্লোগান নারীর মানবাধিকারের ঐতিহাসিক, বৈশ্বিক, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে একটি ঘোষণা উচ্চারিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালার আলোকে একই বছর ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধের ঘোষণা- Declaration on the Elimination of Violence Against Women। ১৯৮১ সাল থেকে জাতিসংঘ সিডও সনদে Principal of Equality সংযুক্ত করা আছে। Equality- এর ব্যাখ্যায় বুঝানো হয়েছে Equality Needs Equal Opportunity- সমতার জন্য চাই সমান সুযোগ, Equality Needs Equal Result- সমতার নীতির সমান ফলাফল, Accountibility of States- রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।[৫] ১৯৯৩ সালের Viena Declaration and Plan of Action- এ ঘোষিত নীতিমালার আলোকে পরবর্তী সময়ে ১৯৯৪, ৯৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলন, ICPD ১৯৯৪ ও চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এর কর্মসূচিতে Human Rights of Women অধ্যায়েও নারীর সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ গতি আসে মূলত ১৯৯৫ সালের বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর হতে।

## বাংলাদেশে নারী অধিকার রক্ষায় প্রণীত আইনসমূহ

### ১৯৭২-১৯৮০

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ ও ২৮ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার এবং নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। সেসাথে ধারা ২৮(৪)-এ নারীর উন্নয়নের জন্য এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার ইতিবাচক ব্যবস্থা নিতেও বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারবে বলেও উল্লেখ আছে।[৬] স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়টি উল্লেখ আছে।[৭] তাছাড়া জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও সংবিধানে বলা আছে।[৮] নারীদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৪' পাশ হয় এবং এর মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা হয়। তবে পরবর্তীতে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন (রদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অনুচ্ছেদ ২(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিলুপ্ত করা হয়। বিলুপ্ত ফাউন্ডেশনের সকল দায়-দায়িত্ব মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করা হয়।[৯] শিশু আইন, ১৯৭৪-এ চার বছরের বেশি বয়সি কোনো শিশুকে পতিতালয়ে রাখলে বা পাঠানো

হলে কিংবা ষোল বছরের কম বয়সি নারী শিশুকে প্রলোভন দেখিয়ে পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহিত করলে সে ব্যক্তির দুই বছরের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার কথা বলা আছে।[১০] ১৯৭৪ সালে 'The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) নামে একটি বিশেষ আইন পাশ হয়। এ আইনে বলা হয় প্রতিটি মুসলিম বিয়ে এ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রার নিজে বিয়ে সম্পাদন করলে তখনই তা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আর অন্য কেউ করলে বর বিয়ের ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারকে রিপোর্ট করবেন ও রেজিস্ট্রার তখন রেজিস্ট্রেশন করবে।[১১]

১৯৭৬ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটনের জনসাধারণ ও আটককৃত ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বিষয়ে প্রণীত হয় Dhaka Metropolitan Police Order- 1976 (Ordinance No. III of 1976)। যেখানে নারী ও শিশুদের সাথে সব সময় সম্মান ও শালীনতা বজায় রেখে ভদ্রভাবে আচরণ দেখানোর কথা বলা হয়।[১২] তাছাড়া উক্ত আইনে নারীকে উত্যক্ত করা ও এর শাস্তি বিষয়ে বলা আছে। কেউ যদি নারীর সম্মুখে রাস্তায়, সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা ঘরের মধ্যে বা বাহিরে নিজের শরীর এভাবে উপস্থাপন করেন যাতে কোনো মহিলা তাকে দেখতে পায় কিংবা রাস্তায় অশালীন ভাষা, আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গীর বা মন্তব্যের মাধ্যমে কোনো মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করে তবে উক্ত ব্যক্তির একবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ড প্রদান করা হবে।[১৩] সরকার নৌভ্রমনে নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিতে ১৯৭৬ সালে ৭২ নং অধ্যাদেশ (The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976)- এর মাধ্যমে আইন জারি করতে পারবে বলে জানায়। এর মাধ্যমে নারীযাত্রীদের নৌভ্রমণে কিছুটা নিরাপত্তা প্রদানের উদ্যোগ চালু হয়।[১৪] বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অর্ডিন্যান্সের (The Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে সরকার কর্তৃক নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধি ছাড়া সরকার মনোনীত আরও চার জন সদস্যের মধ্যে শিশুকল্যাণে নিবেদিত ২ জন নারী থাকতে হবে বলে বলা হয়।[১৫] ১৯৭৭ সালে ২৬ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পৌরসভা নির্বাচনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করার সুযোগ ছিল।[১৬] বিয়েতে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া বন্ধ করা ও পারিবারিক জীবনে নারীর নিরাপত্তার জন্য ১৯৮০ সালে প্রণীত হয় 'The Dowry Prohibition Act (Act No. XXXV) of 1980'। আইনটি ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮০ তে পাশ হয়। বিয়েতে কোনো পক্ষ বা পিতা-মাতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো বিয়ের সময় বা আগে অথবা পরবর্তী সময়ে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করলে তা যৌতুক বলে গণ্য হবে।[১৭] হিন্দুদের ক্ষেত্রে স্ত্রীধন বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট কিছু আইনটিতে না থাকায় হিন্দু নারীর আইন স্বীকৃত স্ত্রীধনও যৌতুকে পরিণত হয়। তাছাড়া The Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980) আইনের মাধ্যমে

সরকার কর্তৃক নারী প্রতিনিধি প্রেরণ প্রসঙ্গে বলা হয় মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলে সরকার দু'জন নারী প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।[১৮]

**১৯৮১-১৯৯০**

১৯৮৩ সালে সরকার কর্তৃক নারী প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে The Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLI of 1983) অধ্যাদেশটিতে দু'জন মহিলা সদস্য নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা আছে। অন্যদিকে The Bangladesh Nursing Council Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXI of 1983), এ নার্সিং কাউন্সিলে সরকারের সমাজ ও মহিলা কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনীত হবে বলা আছে।[১৯] The Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985), Section 5 & 8 -এ ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ফান্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে এবং সিলেকশন কমিটিতে নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব পদাধিকারবলে সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে বলা আছে।[২০] ১৯৮৫ সালের ৩০ মার্চ The Family Courts Ordinance, 1985 (Ordinance No. XVIII of 1985) পাশ হয়। পারিবারিক মামলাসমূহ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পৃথক আদালতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথমে মুন্সেফ আদালতকে পারিবারিক আদালত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। পরবর্তীতে সকল সহকারী জজ আদালতকে পারিবারিক আদালত এবং সকল সহকারী জজকে পারিবারিক আদালতের বিচারক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[২১] ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দশম সংশোধনীতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারিত হয়। সেখানে বলা হয় জাতীয় সংসদের পরবর্তী বৈঠকের তারিখ থেকে দশ বছরের জন্য ৩০ জন মহিলা সাংসদকে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত করার বিধান সংযুক্ত হলো।[২২]

**১৯৯১-২০০০**

১৯৯১ সালে নারীর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন (১৯৯১ সালের ৯ নং আইন) প্রণয়ন করা হয় জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। এ সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনোনয়ন দেবেন রাষ্ট্রপতি এছাড়া বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা পরিষদ থাকবে বলা হয়। মহিলাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংস্থাটির পক্ষ হতে সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বাবলম্বিতা, আইনগত অধিকার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার বিষয়সমূহ উক্ত আইনের মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।[২৩] ১৯৯৭ সালে ১৯৮৩ সালের The Local Government (Union Parishads) Ordinance (Ordinance No. LI of 1983) আইনটিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

যেখানে বলা হয় একজন চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসন থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যসহ ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে।[২৪]

**২০০০-২০১০**

২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০ সালের ৮নং আইন) প্রণীত হয় যা মূলত ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটির সংশোধন বলা যায়। নারীর প্রতি সংগঠিত বিভিন্ন অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখে ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইনটি পাশ হয়।[২৫] ২০০১ সালে The Local Government (Union parishads) Ordinance (Ordinance No. LI of 1983) এ ১৯৯৭ সালে যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তার সংশোধন পুনরায় করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী প্রতিটি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য ঐ এলাকার জন্য গঠিত সমাজ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কর্তব্য পালন করবেন।[২৬] ২০০১ সালে The Representation of the People Order, 1972 (President's Order No. 155 of 1972) আইনটি সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের পূর্বশর্ত হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল কমিটিতে ৩৩% নারী সদস্য রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[২৭] ২০০২ সালে অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০২ সালের ১ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২(২০০২ সালের ২ নং আইন) নামে অন্য একটি আইন করা হয়। উক্ত আইনে অ্যাসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। দোষী ব্যক্তির নিকট থেকে জরিমানা আদায় করে তা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেয়ার বিধানও আইনটিতে রয়েছে।[২৮] ২০০২ সালে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১৬ নং আইন) পাশ হয় ঢাকা জেলার মাতুয়াইলে শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য। যার লক্ষ্য ছিল মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা।[২৯] ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে সংশোধনী আনা হয়। সেখানে ধর্ষণের সংজ্ঞা ও শাস্তির বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এ সংশোধনীতে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সম্মতি দানের বয়স চৌদ্দ থেকে ষোল বছরে উন্নীত করা হয়। ধর্ষণের ফলে জন্মগ্রহণ করা শিশুর বিষয়ে বিধান রাখা হয়েছে। ২০০৩ সালে ধর্ষণ বিষয়ে সংজ্ঞা ও শাস্তিতেও পরিবর্তন এসেছে। শাস্তি হিসেবে জেল জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাথে আত্মহত্যার প্ররোচনা দানের শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারীর সংবাদ প্রচারের বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে উক্ত আইনের মাধ্যমে।[৩০] ২০০৪ সালে জাতীয় সংসদ(সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৩০ নং আইন) পাশ হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীনে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বণ্টন করা, বণ্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ করা এবং

এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের বিধানের জন্য এ আইন করা হয়। যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোনো মহিলা নাগরিক এ পদে নির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন।[৩১]

২০০৬ সালে এশীয় অঞ্চলের মেধাবী গ্রামীণ ছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরে পেশাগত নারী নেতৃত্ব গঠনের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন হয়। ৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪০ নং আইন) প্রণীত হয়। আইনটিতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের কথা বলা হয়।[৩২] অন্যদিকে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হয় ২০০৯ সালের ৫ মার্চ। এর মাধ্যমে নারী পুরুষের সমতা আনা হয়েছে। ১৯৫১ সালের আইনে বাংলাদেশী পুরুষ বিদেশি নারী বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পেত তবে কোন নারী বিদেশি পুরুষকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পেত না। এ আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে সমতা এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের তিনজন আইনজীবীর জনস্বার্থে একটি রিট আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ২৪ মে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের প্রতি রুল জারি করে এ মর্মে যে, ফতোয়া ও শরীয়াহ নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানকে কেন বেআইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না। ইতোপূর্বে হাইকোর্ট বিভাগ ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন ছিল।[৩৩] ২০১০ সালের ৮ জুলাই হাইকোর্টের এক রায়ে ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনা ও শাস্তি প্রদান করাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ফতোয়ার সাথে শাস্তি প্রদান বাংলাদেশ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারার আওতায় অপরাধ হিসেবে গণ্য বলেও উল্লেখ করা হয়। সে সাথে ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ৩১, ৩৫ (১) (৫) এর পরিপন্থি। ২০১০ সালের ২২ আগস্ট এক রায়ে মহামান্য হাইকোর্ট কাউকে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না মর্মে রায় প্রদান করে। এছাড়া আইনে ধর্ষণের মাধ্যমে জন্ম নেয়া শিশুর ভরণ-পোষণ রাষ্ট্র বহন করবে বলা হলেও ২০১০ সালে প্রথম আদালতের রায় ও সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে আইনের বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়।[৩৪] ২০১০ সালে হাইকোর্টের এক রায়ে বাল্যবিবাহ রোধে জন্ম সনদ যাচাই করতে বলা হয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, ১৮ বছরের আগে কোনো নারীর বিয়ে দেয়া দন্ডনীয় অপরাধ।[৩৫] অক্টোবর ২০১০ এ জাতীয় সংসদে পাশ হয় পারিবারিক নির্যাতন (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ১৯৮৯ এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশু সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে এ আইন প্রণীত হয়। যা বাংলাদেশের নারীদের সুরক্ষার একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৩৬]

**২০১১-২০২০**

২০১১ সালের ৮ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করা হয়। যেখানে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন দূর করাসহ বিভিন্ন সুযোগের কথা বলা আছে। এ নীতিতে প্রচলিত এবং ধর্মীয় বিধানে নারী যে সম্পত্তির অধিকারী সেই সম্পদে কেবল নারী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবার কথা বলা আছে। যা সম্পত্তিতে সমঅধিকারের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[৩৭] ২০১১ সালে ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন পাস হয়। যেখানে গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান রাখা হয়। কোনো ভবঘুরে বা নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে গর্ভবতী অবস্থায় আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠানো হলে সন্তান জন্ম দেওয়ার পর তিনি অনধিক দুই বছর পর্যন্ত সন্তানসহ আশ্রয় কেন্দ্রে থাকতে পারবেন এবং তার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।[৩৮] ২০১২ সালে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ প্রণীত হয়। পর্নোগ্রাফির উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণও নিষিদ্ধ করা হয় এ আইনে। ২০১২ সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ প্রণীত হয় নারীদের সুরক্ষায়। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে আইন কমিশনের দীর্ঘ সুপারিশের মধ্যে শুধু বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি পাশ হয়। শুধুমাত্র ঐচ্ছিকভাবে কেউ চাইলেই বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি আইনটি পাশ হয়।[৩৯] এছাড়া ২০১২ সালে রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এ সংশোধনকল্পে কিছু বিধান সংযোজিত হয় ও কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি দান করার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া এ বছর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রুলস পার্ট (১০)- এর রুল ১৯৭ অনুযায়ী চাকরিতে যোগ দেয়ার ৯ মাস পূর্ণ না হলে নারী কর্মকর্তা মাতৃত্বকালীন ছুটি পেতেন না তা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপনে বাতিল হয়।

২০১৫ সালে প্রণীত গণকর্মচারি (বিদেশি নাগরিকের সহিত বিবাহ) আইন ২০১৫ বাংলাদেশের নারীদের প্রতি চরম বর্বর, নিষ্ঠুর এবং অপমানমূলক। ২০১৭ সালের শুরুর দিকে বিশেষ অবস্থায় ১৮ বছরের কম বয়সি মেয়েদের বিয়ের সুযোগ রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন এ আইনে ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স আগের মত ২১ বছর এবং মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর রাখা হয়েছে।[৪০] ২০১৮ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ আরো ২৫ বছর বাড়ানোর জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল আনা হয় এবং পাশ করা হয়। নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনসমূহ মনে করে এর মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটবে। ২০১৮ সালে নারী সুরক্ষার জন্য যে বিশেষ দুটি আইন পাশ হয় তা হলো যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮। ২০১৭ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন নিয়ে সমালোচনা হওয়ার পর ২০১৮ এর বিধিমালা প্রণয়নে সরকার কঠোর হবে বলা হয় যাতে বিশেষ ধারাটির কোনো কার্যকারিতা না থাকে। তবে বিধিমালায় এর কোনো প্রয়োগই লক্ষ করা যায় না। এর সাথে ২০১৮ সালে উচ্চ আদালত মাননীয় হাইকোর্টে দু'টি মামলায় যুগান্তকারী রায় দেওয়া হয় যার একটি হলো ধর্ষণসহ যে কোনো

প্রকারের যৌন হয়রানির মামলার বিচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনসমূহের অপূর্ণতা দূর করার লক্ষে আদালত ১৮টি নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে ধর্ষণ প্রমাণে টু ফিঙ্গার টেস্ট এবং বায়ো ম্যানুয়াল টেস্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রায় দেয়। এক রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করার প্রসঙ্গে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও এ কে এম শহিদুল হক এ রায় দেন। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর ক্ষেত্রে এ টেস্ট করা আইনি বা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই বলে এ রায়ে উল্লেখ করা হয়।[৪১] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২০ আইনটি অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত হয় ২০২০ সালে। এর মাধ্যমে ২০০০ সালের ৮ নং আইনের ধারা ৭, ৯, ১৯, ২০, ৩২ এর সংশোধন হয় এবং ৮ নং আইনে নতুন ধারা ৩২ ক এর সন্নিবেশ হয়।

**আইন প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতা**

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বা নারী অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে সকল আইন, নীতিমালা বা সনদ প্রণীত হয়েছে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে রয়েছে নানান প্রতিবন্ধকতা। CEDAW তে বর্ণীত অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর নারী অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাতে হয় এবং বিগত প্রতিবেদনে যেসব বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সরকার কী ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়েছে বা কেন নেওয়া হয়নি তা জানাতে হয়। বাংলাদেশ ২০০২ সালের পঞ্চম নিয়মিত প্রতিবেদনেও CEDAW - এর অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ১৬.১ (গ) সম্পর্কে আগের অবস্থানে ছিল যে, উক্ত অনুচ্ছেদসমূহ এদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তবে বিষয়টিকে প্রত্যাহারের জন্য বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের প্রতিবেদনেও একই কথা বলা হয়েছিল। যেখানেও CEDAW কমিটির বক্তব্যকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, যে বক্তব্যে বলা হয়েছিল অনুচ্ছেদ ২ হচ্ছে কনভেনশনের মৌলিক বিধান এবং সম্পূর্ণরূপে নারী অধিকার বাস্তবায়নে অনুচ্ছেদ ১৬ অত্যাবশ্যক।[৪২] বাংলাদেশ কনভেনশনের এ বিধানগুলোর সাথে শরীয়া আইনের বিরোধ উল্লেখ করে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করছে। যদিও এ সংরক্ষণ নীতি বাংলাদেশের সংবিধানেরও পরিপন্থি কেননা সংবিধানে ধর্ম, গোত্র, জন্মস্থান নারী-পুরুষের বৈষম্য থেকে মুক্তির কথা বলা আছে।[৪৩] নারীর মানবাধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে আইনি ও নীতিগতভাবে স্বীকৃত হওয়া মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এ ধরনের নেতিবাচক ভূমিকা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে যেসব বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে পারিবারিক আইনে সাম্যভিত্তিক বিধান প্রণয়নে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের যে প্রতিরোধ তা অন্যতম। এ দেশে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় প্রথার উপর ভিত্তি করে পারিবারিক আইন প্রণীত হয় এবং পারিবারিক অধিকারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব

সম্পর্কীত আইনসমূহ ধর্মীয় নীতিমালার আলোকে প্রণীত হয়। এসব আইনে নারী পুরুষের বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড বা শাস্তি না হওয়া। কৃষিতে নারীর অবদান থাকলেও জমির মালিকানা বিষয়টি আছে বলে কৃষিতে নারীর অবদান সেভাবে মূল্যায়ন হয় না বা ডকুমেন্টেশনও হয় না। কৃষি জমির ওপর নারীর মালিকানা মাত্র ১০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত 'ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন সার্ভে ২০১১' নামে যে জরিপ করা হয় সেখানে সমাজে বিবাহিত নারীদের মধ্যে প্রায় ৮৭ শতাংশ স্বামী বা তার পরিবারের আপনজনের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। হিন্দু নারীদের জন্য বাস্তবতা হচ্ছে ভারতে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু পারিবারিক আইনে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হলেও বাংলাদেশে এখনও হিন্দু নারীরা ব্যক্তিগত জীবনে এমন আইন দ্বারা শাসিত যে বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব সবকিছুতে তাদের অধিকার সীমিত বা একেবারেই অধিকার বঞ্চিত। বিবাহ নিবন্ধনের আইন করা হলেও সেটি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা যায়নি। নারী অধিকার ভিত্তিক সংগঠন এবং অন্যান্য মানবাধিকারভিত্তিক সংগঠন যারা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের প্রতিনিধিরাও মৌখিক হুমকি, প্রশাসনিক হয়রানি এবং যৌন হয়রানির মত সহিংসতার শিকার।

*দৈনিক অবজারভার* পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১০-২০১২ সালে বাংলাদেশ পুলিশ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার অভিযোগ পায়। তবে এর মধ্যে মাত্র ৬ হাজার প্রকৃত অভিযোগ হিসেবে আমলে নিয়েছে।[৪৪] অনেক সময় মামলা গ্রহণ করা গেলেও তদন্ত শেষ হতে বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়। ২০১৪ সালে 'স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট' এবং 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, ৭০ শতাংশ নারীর সম্পদের মালিকানা নেই। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের ৮২% জানান তাদের সম্পদে নিজেদের অধিকার বা মালিকানা নেই। সম্পদ ব্যবহারে মাত্র ২৬% নারী মতামত দিতে পারে। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া করে বাল্যবিবাহের হার নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করা হলেও 'গার্লস নট ব্রাইড' এর গবেষণা তথ্য মতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত আর বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি।[৪৫] ইউনিসেফ এর এক গবেষণায় ২০১৬ সালে দেশের এক সার্বিক চিত্রে দেখা যায়, প্রায় ২২% মেয়েশিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীর বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগে বিয়ে হয়। প্রায় ৫৯% নারীর ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়।[৪৬] আইন ও নীতিমালা কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছাড়া মূল্যহীন হয়ে যায়। প্রশাসনিক পর্যায়ে সীমাহীন অবস্থা ও শৈথিল্য আইন বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জনবল ও সম্পদের অপ্রতুলতাও অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

**আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি**

নারীর প্রতি বৈষম্যের বিভিন্ন খাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মভিত্তিক পার্সোনাল ল'র প্রভাবে উত্তরাধিকার, বিয়ে, বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, শিশুর হেফাজত, দত্তক নেয়ার ক্ষেত্রে পরিবারে নারীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সম্পত্তি ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে নারীর প্রতিবন্ধকতা আছে।[৪৭] CEDAW এর পূণার্ঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব না হলেও কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত হয়েছে। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫; মুসলিম পারিবারিক আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ নারীর অধিকার ও অবস্থানের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়। ১৮৯০ সালের সন্তানের তত্ত্বাবধান প্রশ্নে অভিভাবক ও প্রতিপাল্য/প্রতিপোষ্য আইনে নারীর অধিকার শর্তসাপেক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে পুত্র সন্তানকে ৭ বছর এবং মেয়ে সন্তানকে বয়সন্ধিকাল পর্যন্ত কাছে রাখার। এর ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে সরকারি পরিপত্রের মাধ্যমে সব দাপ্তরিক নথিতে বাবার নামের সাথে মায়ের নাম লিপিবদ্ধ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে নাগরিকত্ব বিষয়ক আইনগুলোও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এ বৈষম্য দূর করার জন্য নাগরিকত্ব আইন (১৯৫১) এর ধারা ৫ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করা হয়। তবে মায়ের নাগরিকত্ব সন্তানের ওপর বর্তানোর বিষয়ে কোর্ট একটি সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে পূর্বের আইনের প্রাধান্য ধরে রেখেছে। সম্পত্তি, জমি-জমা বা উত্তরাধিকারের বিষয়েও নারীদের জন্য বৈষম্যমূলক আইন রয়েছে। ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়নে প্রণীত জাতীয় নীতিতে ভূমিতে নারীর সমান অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়। ভূমি আইন সংস্কার সম্পর্কিত বিষয় কার্যকরের সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৮৩ সালে। সেখানে বলা হয় সরকারি খাস জমি বিতরণের সময় বরাদ্দকৃত জমি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামেই রেজিস্ট্রেশন করা হবে। নারীরা বিধবা, বিবাহ বিচ্ছেদ বা পরিত্যক্ত হলে ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ পেতে ভীষণ সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। গ্রাম্য সালিশ হতে শুরু করে বিচারাদালত সব ক্ষেত্রে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা থাকে বলে নারীরা উপেক্ষিত হয়। ১৯৮৩ সালে যৌতুক নিরোধ আইন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা যৌতুকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়াকে নিরুৎসাহিত করে। কেননা এ আইন অনুযায়ী যৌতুক গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের জন্যই শাস্তির বিধান রয়েছে। ২০০২ সালে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের ৩৫৮টি ঘটনার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের কম ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। ২০০২ সালে অ্যাসিড নিক্ষেপ অপরাধ দমন আইন, ২০০২ এবং অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ পাস করার পরও দীর্ঘদিন অ্যাসিড নিক্ষেপের হার কমেনি। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নারী পাচার করার ক্ষেত্রে একটি হাই রিস্ক দেশ হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সীমান্ত

অঞ্চলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ সীমান্ত পয়েন্টগুলোতে আশ্রয়কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নারী নির্যাতনের একটি বড় কারণ ফতোয়া। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে গ্রামের মসজিদের ইমামগণ এ ধরনের ফতোয়া জারি করেন এবং গ্রাম্য সালিশে ফতোয়া প্রদান করা হয়। ১৯৯৭ সালে ২৮টি, '৯৮ সালে ২৮টি, '৯৯ সালে ২৬টি, ২০০০ সালে ৩১টি এবং ২০০১ সালে ৩৪টি ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।[৪৮] অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামের গরিব অসহায় নারীরা এ ফতোয়ার শিকার। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ফতোয়া ও হিল্লা বিয়ের বিরুদ্ধে একটি সুয়োমোটো রুল জারি করে। যেখানে বলা হয় রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থায় শুধু আদালতকেই মুসলিম আইন ব্যবস্থা বা অন্য যে কোনো প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা বা আইনগত মতামত প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সেইসাথে এ মামলার বিচার্য ফতোয়াসহ সকল প্রকার ফতোয়া কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং বেআইনি।[৪৯] তবে এর মধ্যেও ২০০২ সালে ৩২টি ফতোয়া দেয়া হয়। ২০১৬ সালে আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পরও ১২টি সালিশ ও ফতোয়ার ঘটনা ঘটে। ২০০৯ সালেও নারী বিষয়ক আইন ও অধিকার প্রশ্নে ফতোয়ার দৌরাত্ম্য অনেক বেশি ছিল।[৫০] অন্যদিকে নারীদের জেল-হাজতে রাখার নিয়ম ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মাধ্যমে বন্ধ হলেও এ বিধান নারীদের জন্য সহায়ক না। সেফ কাস্টডিতেও নারীদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয় না। কেননা নারীদের এসব আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের একটি সম্ভাবনা থাকে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস এর রিপোর্টে দেখানো হয় ১৯-২০% নারী নিজের ইচ্ছায় ভোট দিতে পারেনা, ৮৮% স্বামীর সংসারে শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ৮৬% মানসিক নির্যাতনের শিকার আর যৌন নির্যাতনের শিকার হন ৫৫% নারী। কর্মক্ষেত্রে ১৬% নারী শারীরিক নির্যাতন, ২৬% মানসিক নির্যাতন আর ২৯ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার।[৫১] নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সরকার যেসব আইন প্রণয়ন করেছে তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

**গবেষণার প্রায়োগিক দিক**

বিচারব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতার বাধাসমূহ মূলত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইন প্রয়োগে বাধা তৈরি করে। ধর্ষণ, হত্যা, ফতোয়া, পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন, অ্যাসিড সন্ত্রাসের মতো ঘটনাসমূহ বর্তমানে নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় দিক হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। আইন না থাকার জন্য নারীরা অনেক সময় প্রতিকার

পায় না আবার বাস্তবায়ন না হলেও পায় না। আইন বিষয়ে একটি ধারণা যুক্ত হয়েছে যে, নারী নির্যাতনের অধিকাংশ মামলাই মিথ্যা, ফলে একের পর এক নারীদের পক্ষে কোনো আইন প্রণীত হলে সেখানে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য বিভিন্ন ধারাও সংযুক্ত করা হচ্ছে। নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ উত্ত্যক্তকরণের জন্য সংযোজিত একটি ধারা ছিল ১০ (২) ধারা যা পরবর্তীতে ২০০৩ সালে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই বাদ দেয়া হয়। যৌন হয়রানির মত বিষয়গুলোতে প্রতিবাদ করলেও প্রতিটি পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছাড়া আইন কিংবা এর নীতিমালা অর্থহীন হয়ে পড়ে। নারী অধিকারের ক্ষেত্রে আইনি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক পর্যায়ে উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও শিথীলভাব লক্ষ করা যায়। সম্পদের অপ্রতুলতা এবং জনবলের ঘাটতি জাতীয় পর্যায়ে নারীর সমতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটিকে জটিল করছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারী শ্রম বিদ্যমান শ্রম আইনের বাইরে রয়ে গেছে। যেসব আইনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন খুবই অস্পষ্ট সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব, প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতির বিষয়সমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশগম্যতার বাধাসমূহ মূলত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। আইন প্রণয়ন করলেও সচেতনতার অভাব, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং প্রতিকার পেতে নারীর বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে অনিহা প্রকাশ করা বিষয়গুলো বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। যৌতুক বিরোধী আইন থাকলেও এর কার্যকর প্রয়োগ নেই অনেক ক্ষেত্রে। আক্রান্ত নারী ও পরিবারের প্রতি হুমকি এবং প্রয়োজনীয় ফরেনসিক প্রমাণের অভাবে অনেক সময় অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, অপরাধীদের প্রভাব-সম্পদ ও শক্তি সহিংসতার শিকার নারীর তুলনায় বেশি থাকার ফলে পুলিশ বা তদন্তের ওপর এর প্রভাব পড়ে। শিক্ষাব্যবস্থায়, পাঠ্যসূচিতে সুস্পষ্টভাবে জেন্ডার-বৈষম্য দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আন্তরিক ও আদর্শিক দায়বদ্ধতা থেকে নারী-কিশোরী, শিশুকন্যা নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন নীতি গ্রহণ করতে হবে। নারী নির্যাতনের ভয়াবহ একটি দিক হলো সাইবার অপরাধ। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার যুগে নারীর প্রতি অমানবিক আচরণের বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সাইবার ক্রাইম। নারীর প্রতি সামাজিক-পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিও এ অপরাধকে উৎসাহিত করে। যা আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করতে হবে। ২০২২ সালে সাক্ষ্য আইনে ধর্ষিত নারীর বিচারে তার চরিত্রের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা ও নারীকে দুশ্চরিত্র প্রমাণের বিষয়টি বাতিল করে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর সংশোধন করা হয়েছে। আইনটির দুটি ধারায় আইনগতভাবে ধর্ষণের ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রে অভিযোগকারী নারীকেই চরিত্রহীন প্রমাণের যে সুযোগ ছিল তাতে প্রায়শই দোষী ব্যক্তি

ছাড়া পেয়ে যেত।[৫২] এছাড়া নারীর পারিবারিক বিষয়সমূহ বৈষম্যমূলক ধর্মীয় আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সংবিধানের মূল চেতনার সাথে যেমন সাংঘর্ষিক তেমনি CEDAW চুক্তিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির পরিপন্থি। যে কারণে সর্বজনীন পারিবারিক আইন প্রতিষ্ঠার দাবি নারী অধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। নারীর আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি, তার মর্যাদা ও সমঅধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতির চর্চা প্রয়োজন।

**উপসংহার**

নারীর সম-অধিকারের জন্য চাই সমান সুযোগ। নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবে তার প্রয়োগ ও কর্মপরিকল্পনাও সেইসাথে থাকতে হবে। নারীরা যে শুধু নারী না মানুষও এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর নারীরা লড়াই করে আসছে। যেহেতু নারীকে আইনিভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বা দ্বিতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে নারীর প্রতি সকল প্রকার নিষ্ঠুর আচরণের সূচনা। নারী সমাজে যে প্রকারেই সহিংসতার শিকার হোক না কেন তা নারীকে রাষ্ট্র কিংবা বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে বা প্রতিষ্ঠিত হতে প্রতিনিয়ত বাধা তৈরি করে। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে নারী অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অনেক না পাওয়ার মধ্যেও কিছু ছোটো ছোটো আইন সংস্কারের মাধ্যমে এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো কোনো নারী সুবিচার পেলেও বিচারহীনতার সংস্কৃতিতে এ সংখ্যা নগণ্য। পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, কাঠামো ও অভ্যাস বজায় রেখে নারীর সমঅধিকার, মানবাধিকার বা সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। এর জন্য রাষ্ট্রকে যথাযথ দায়িত্ব নিয়ে নারী নীতিমালা ও নারীর স্বার্থ রক্ষাকারী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে ও অভ্যাসের পরিবর্তন আনতে ব্যাপক কর্মসূচি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশনা, সনদ, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলা ও কার্যকর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এখন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের পাশাপাশি নারীর মানবাধিকার তথা নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলনমূলক সংগঠনের কার্যকরী ভূমিকা বৃদ্ধি আবশ্যক। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাড়াতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কার্যকর আইনি কাঠামো তৈরি করে ফলপ্রসূ কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে সহিংসতা রোধ ও প্রতিকারে সমন্বিত কোনো কার্যকর ব্যবস্থা আসে। নারী

অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সব মানুষের সমান মর্যাদা এবং অধিকারের প্রশ্নে যেকোনো মতদ্বৈততা ছেড়ে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

## টীকা ও তথ্যসূত্র

১. R. J. Shafer, *'A Guide to Historical Method'* (Illinois: Dorsey Press, 1974), 19.

২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৫ মে, ২০১০।

৩. প্রস্তাবনা, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮।

৪. প্রস্তাবনা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW), ১৯৭৯।

৫. Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by the world conference on Human Rights, held in Vienna from 14 to 25 June 1993. Section 11 A.3 The equal status and human rights of women (extract).

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২৭-২৮।

৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ০৯।

৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১০।

৯. The Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation (Repeal) Ordinance, 1984 ( Ordinance No XXXVII of 1984).

১০. The Children Act, 1974 (Act No XXIX of 1974), Sections 41-41.

১১. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) (Amendment) Act, 2005 (Act N IX of 2005) Section 5.

১২. The Dhaka Metropolitan Police Order- 1976, (Ordinance No III of 1976), Section 16(e).

১৩. The Dhaka Metropolitan Police Order- 1976, (Ordinance No III of 1976), Section 76.

১৪. The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976), section 82.

১৫. The Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976(Ordinance No. LXXIV of 1976), Section 5.

১৬. The Paurashava Ordinance, 1977(Ordinance No. XXVI of 1977), Sections 6.

১৭. The Dowry Prohibition Act (Act No. XXXV of 1980), Section 2.

১৮. The Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980), Section 3(u).

১৯. The Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLI of 1983), Section 4 এবং The Bangladesh Nursing Council Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXI of 1983), Section 4.

২০. The Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985), Section 5 &8.

২১. The Family Courts Ordinance, 1985 (Ordinance no. XVIII of 1985), Section 5, 11.

২২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)।

২৩. জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ৯নং আইন), ধারা ৭।

২৪. The Local Govermnent (Union Parishads) (Second Amendment) Act, 1997(Act No. XX of 1997).

২৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৮নসং আইন), ধারা ৮।

২৬. The Local Govermnent (Union Parishads) (Amendment) Act, 2001(Act No. XXI of 2001).

২৭. The Representation of the People (Amendment) Act 2001 (Act No. LVIII of 2001) -পূর্বের আইনের ৯০খ ধারাসহ ৬ক অধ্যায়টি সংশোধিত আইনের ৩৯ ধারা বলে অন্তর্ভূক্ত।

২৮. এসিড অপরাধ দমন, আইন, ২০০২(২০০২ সালের ২নং আইন), ধারা ৫, ৬-৯।

২৯. শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১৬ নং আইন), ধারা ৭।

৩০. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩০ নং আইন) ধারা ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ৫৩, ৫৪।

৩১. জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন ২০০৪, (২০০৪ সালের ৩০ নং আইন), ধারা ৪, ৮।

৩২. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪০ নং আইন), ধারা ৩।

৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২৫ মে, ২০১০।

৩৪. *দৈনিক যুগান্তর*, সমকাল, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৩ জুলাই ২০১০।

৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ৯ অক্টোবর ২০১০।

৩৬. পারিবারিক সহিংসতা(প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

৩৭. জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতি, ২০১১।

৩৮. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন ) আইন, ২০১১; ধারা ১২।

৩৯. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২।

৪০. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭।

৪১. *বিডিনিউজ২৪*, ঢাকা, ১২ এপ্রিল, ২০১৮।
https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1482571.bdnews
(Retrieved on 08/11/2022, 07:00)

৪২. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, Concluding Observations: Bangladesh, U.N./DocA/152/38/Rev-1, Part-II,

Para. 433 (1997) [hereinafter CEDAW, Committee Concluding Observation].

৪৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২৮(১)।

৪৪. http://www.observerbd.com/details.php?id=73030 (Retrieved on 09/11/2022, 09:00)

৪৫. https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/ (Retrieved on 09/11/2022)

৪৬. https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/bangladesh/ (Retrieved on 10/11/2022)

৪৭. ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভি (ইউপিআর), বাংলাদেশ, সংকলিত প্রতিবেদন, ঢাকা, এইচআর ফোরাম অন ইউপিআর, জানুয়ারি ২০০৯।

৪৮. (*প্রথম আলো*, *ডেইলি স্টার*, *ইনকিলাব*, *ভোরের কাগজ*, *সংবাদ*, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, *দিনকাল*) তথ্য সংগ্রহ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) থেকে সংগ্রহীত তথ্য।

৪৯. 'The Fatwa in Question is Wrong', ডেইলি স্টার ল' রিপোর্ট, ২ জানুয়ারি ২০০১, Interventions International Journal of Postcolonial Studies, Vol. 4 (2) 2002, ২৩১- এ উদ্ধৃত।

৫০. *দৈনিক সংবাদ*, ৩১ অক্টোবর, ২০১৬।

৫১. বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস- ২০১১ এর রিপোর্ট।

৫২. BBC NEWS বাংলা, ১৪ মার্চ, ২০২২। https://www.bbc.com/bengali/news-60740284 (Retrieved on 09/11/2022, 08:00)